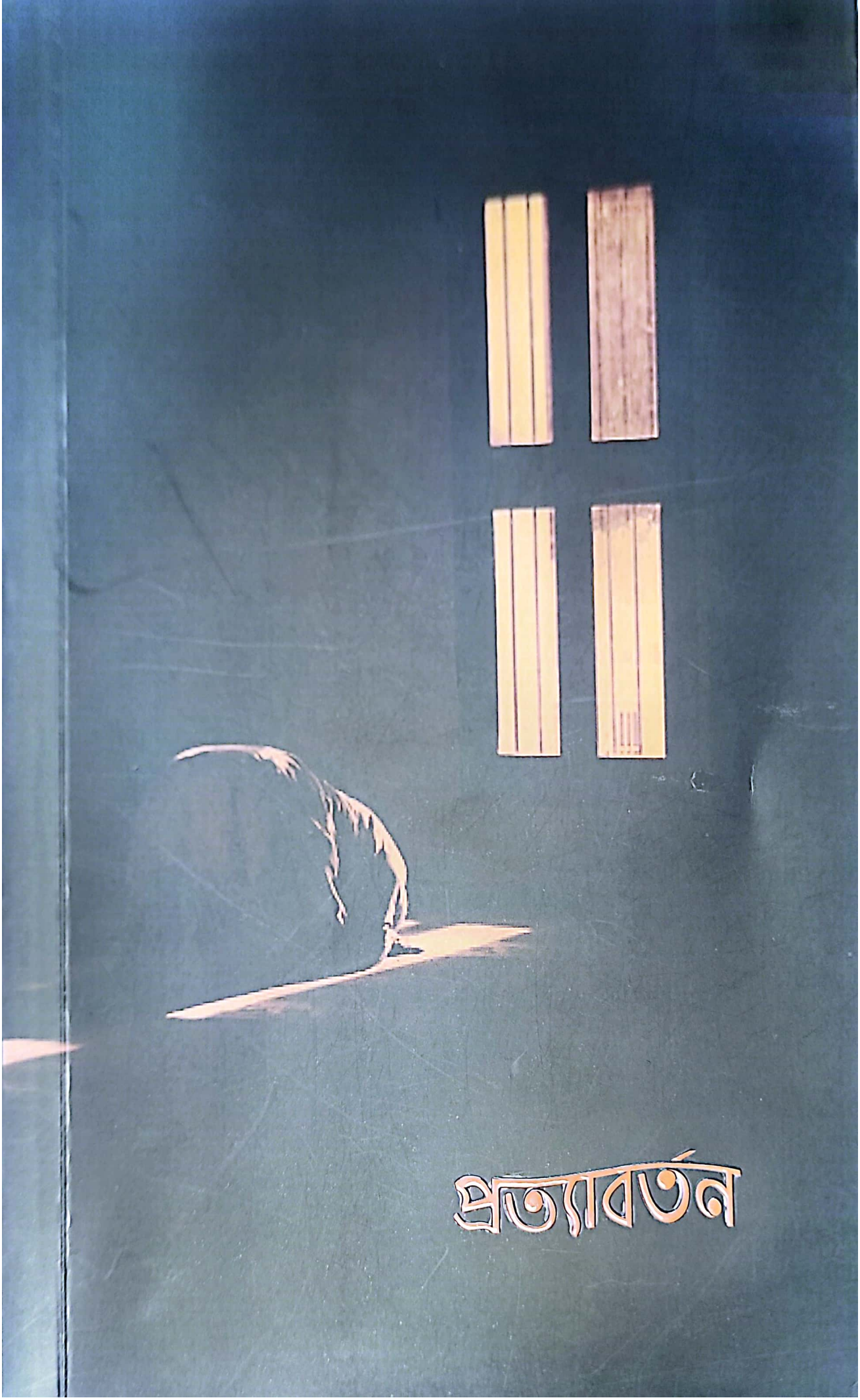
প্রত্যাবর্তন

প্রকাশকের কথা

প্রত্যেকটা বৃত্তের একটা কেন্দ্র থাকে। পৃথিবীতে জীবনাচরণের সেই কেন্দ্রের নাম হচ্ছে ইসলাম। এটিই আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তাআলার কাছে মনোনীত একমাত্র ধর্ম। চির শাশ্বত ধর্ম। পৃথিবীতে মানুষের আগমন এই ধর্মের হাত ধরেই। তাওহিদের একত্ববাদ, শিরকের বিরুদ্ধে লড়াই, কুফরের বিরুদ্ধাচরণের মাধ্যমেই যুগে যুগে বিকশিত হয়েছে ইসলাম। পবিত্র কুরআনুল কারিমে বলা হয়েছে

> *'মানুষ ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত'।*[১]

সেই মানুষ তার প্রবৃত্তি, তার ইচ্ছা, কামনা-বাসনার বশবর্তী হয়ে সেই ধর্ম এবং তার একমাত্র রবকে ভুলে গিয়ে সেখানে স্থান দিয়েছে মিথ্যাকে। সৃষ্ট বস্তুকে তারা গ্রহণ করেছে সৃষ্টিকর্তা হিসেবে। যখনই মানুষ তাওহিদের রাস্তা থেকে বিচ্যুত হয়েছে, তখনই জন্ম নিয়েছে নতুন নতুন ধর্মের।

আমরা যারা জন্মগতভাবে মুসলিম পরিবারে জন্মেছি, বলা চলে আমরা কেন্দ্রের অধিবাসী হয়েই জন্মেছি। তবুও, বেড়ে উঠতে উঠতে, সমাজের নানান সঙ্গতি-অসঙ্গতির ভিতর দিয়ে যেতে যেতে একসময় আমরা পথ হারিয়ে বসি। হয়ে পড়ি কেন্দ্রচ্যুত। আমরা কেবল 'নামে মুসলিম' হয়ে জীবনযাপন করি। তখন আমাদের জীবনযাপন পদ্ধতি আর একজন অমুসলিমের জীবনযাপন পদ্ধতির মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না। আমাদের ধার্মিক জীবন তখন আবদ্ধ হয়ে যায় জুমুআর সালাত

---

১ আল আসর ১০৯ : ০২

এবং দুই ঈদের সালাতের মধ্যে। যা আমাদের নিষেধ করা হয়েছে, তার প্রতি আমাদের তখন তীব্র আকর্ষণ। আর যা আমাদের করতে বলা হয়েছে, তার প্রতি আমাদের দুর্বার অনীহা। আমরা ঢুকে পড়ি একটি অন্ধকার রাজ্যে। নিকষ কালো অন্ধকার।

সেই অন্ধকার রাজ্যের মায়াপথ থেকে কেউ কি বেরিয়ে আসে? কারও কি হুঁশ ফিরে? কেউ কি ফিরে আসে তার কেন্দ্রে? হ্যাঁ, আসে। কেউ কেউ আসে। যারা আসে, তারা খুব দুর্দান্তভাবে ফিরে আসে। সেই পথ ফিরে পাওয়া, নীড়ে ফিরে আসা আত্মাগুলোর গল্প নিয়ে লেখা এই বইটি।

শুধু কি তাই? যার জন্মই কেন্দ্রের বাইরে, সে কি কখনো সন্ধান পায় সিরাতুল মুসতাকিমের? সেও কি পারে তার পূর্বপুরুষদের ধর্ম, দেবতা, ইশ্বরকে অস্বীকার করে চিরাচরিত এক মহাসত্যের দিকে ধাবমান হতে? কেউ কেউ পারে। সেই পবিত্রতম আত্মাগুলোর গল্পগুলো কেমন? সেসব নিয়েও আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

আমরা আশা করছি, এই বই পথহারা হাজারো তরুণ-তরুণীকে পথ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে, উৎসাহ যোগাবে, ইনশাআল্লাহ। জীবন জাহাজের দিশেহারা নাবিককে বাতলে দিবে পথের দিশা। সিরাতুল মুস্তাক্বীমের অমসৃণ কিন্তু সুখময় পথে হাঁটার জন্য এই বইটি যদি একজনকেও অনুপ্রাণিত করে, তবেই আমাদের শ্রম সার্থক।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের কাজগুলোকে কবুল করুন। আমিন।

সরল পথের খোঁজে

মোহাম্মদ রুহুল আমিন, এমবিবিএস, শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ

দীনের বাইরে বড় হওয়া একজন কিশোর যেভাবে, যে পরিবেশে বেড়ে ওঠে, আমার বেড়ে ওঠার গল্পগুলোও ঠিক সেরকম। খুব ডানপিটে স্বভাবের ছিলাম। মানুষকে কষ্ট দেওয়া, পশুপাখিকে কষ্ট দেওয়া, বন্ধুদের সাথে মিলে অন্যের বাগানের আম চুরি করে খাওয়া, আব্বুর পকেটের টাকা চুরি করা, আত্মীয়-স্বজনের সাথে খারাপ আচরণ করা, স্কুল পালানো, সিনেমা হলে যাওয়া, পূজা-মণ্ডপে যাওয়া—ইত্যাদি ছিল আমার জীবনের নিত্যনৈমিত্তিক কাজ।

বাড়িতে নামাজ পড়েতেন শুধু আমার মা। বাবা নামাজ পড়তেন না, শুধু পড়াশোনার জন্যে বকাঝকা করতেন।

মা যদিও নামাজের জন্যে হালকা বকাবকি করতেন; কিন্তু দেখা যেত, জুমার দিন জুমার নামাজেও আমি যেতে চাইতাম না। নামাজে যাওয়ার কথা বলে অন্যদিকে চলে যেতাম। আমি ছিলাম প্রচণ্ড রকম সিনেমার পোকা। তখন আমাদের বাড়িতে টেলিভিশন ছিল না। পাশের বাড়িতে সিনেমা দেখতে দেখতেই আমার বেশিরভাগ সময় কাটত।

আমার এমন ডানপিটে স্বভাবে মা আমার উপর চরম বিরক্ত হয়ে উঠলেন। অবশ্য বিরক্ত হবারই কথা। বাবা আমাকে কথা শোনাতেন কম, আমার কৃতকর্মের সমস্ত ঝাল তিনি মায়ের উপরেই ঝাড়তেন। মায়ের আস্কারাতেই আমি মাথায় চড়েছি, নষ্ট হয়ে গেছি, কু-পথে চলে গেছি—ইত্যাদি নানান কথার বাণে জর্জরিত হতেন আমার মা। মা একদিন করলেন কি, আমাকে পাশের বাড়ি থেকে ধরে বাসায় নিয়ে

CamScanner

এলেন। বাসায় ঢুকিয়ে মা নিজের গলায় দড়ি পেঁচিয়ে আত্মহত্যা করতে চাইলেন। আর চিৎকার করে বলতে লাগলেন, 'আমি মরে গেলে শান্তি পাবি, তাই না? এই দ্যাখ, আমি মরে যাচ্ছি...'

আমি ছিলাম আমার বাবা-মায়ের একমাত্র ছেলে। মা বলেছিলেন, পর পর ছয়টা মেয়ে সন্তানের পর আমি নাকি তাদের কাছে আল্লাহর বিশেষ নেয়ামত হিসেবে জন্মেছি। রক্ষণশীল সমাজের চোখে তখন ছেলেসন্তান মানেই সবকিছু। আর মেয়েসন্তান মানেই বোঝা। আমার বাবা-মায়েরও এরকম ধারণা। তারা ভাবতেন, আমিই তো তাদের অন্ধকারে আলোস্বরূপ। বৃদ্ধ বয়সের লাঠি। এজন্য আমি তাদের কাছে ছিলাম আদরের দুলালের মতো। সেই আমিই যখন এরকম বেঁকে বসলাম, তখন তারা দুজন আমাকে নিয়ে খুব হতাশ হয়ে পড়লেন।

এরপর, হঠাৎ একদিন বাবা অসুস্থ হয়ে পড়লেন। বাবার চিকিৎসা চলাকালীন আমার পড়াশোনায় যাতে কোনোরকম ব্যাঘাত না ঘটে, সেজন্য আমাকে আমার বড় আপুর বাসায় পাঠিয়ে দেওয়া হলো। আপুর শ্বশুরবাড়ির পরিবেশটা ছিল আমাদের পরিবেশের চেয়ে পুরোপুরিই ভিন্ন। পড়াশোনার জন্য চমৎকার একটা পরিবেশ বলা যায়। আশপাশের লোকগুলোও যথেষ্ট ধার্মিক। সবাই নিয়মিত নামাজ পড়ে, পর্দা-হিজাব করে চলে।

এরকম ভালো একটা পরিবেশে এসে আমি যে একেবারেই বদলে গেলাম—তাও না। আমার দুরন্তপনা, ডানপিটে স্বভাবগুলো তখনও বলবৎ ছিল আগের মতোই। আমি খুঁজে খুঁজে আশপাশ থেকে আমার স্বভাবের ছেলেগুলোকে বের করলাম। তাদের সাথে আড্ডা দিতাম। সময় কাটাতাম। আপুর শ্বশুরবাড়ির সবাই যেহেতু ধার্মিকশ্রেণির ছিলেন, আমি নামাজ না পড়লে কেমন যেন একটু বেমানান দেখায়। সমালোচনার ভয়ে মসজিদে যেতে হতো। কিন্তু মন থেকে নামাজ পড়তাম না কখনোই। বন্ধুদের সাথে খেলাধুলা,আমোদ-ফূর্তি করতাম, সিনেমা দেখতাম, নাচতাম, গান গাইতাম—কিন্তু মানসিক তৃপ্তিটা আর পেতাম না।

একদিন সিনেমা দেখার জন্য টিভি অন করলাম। চ্যানেল পাল্টাতে গিয়ে হঠাৎ আবিষ্কার করলাম, কোট-টাই পরা একজন লোক খুব স্মার্টলি কুরআন হাদিসের কথা বলছেন। তার লেকচার শোনার জন্যে নয়, বরং তার কোট আর টাই-ই যেন তার প্রতি আমার কৌতূহলের মাত্রাটা বাড়িয়ে দিল। ইতোপূর্বে কোট-টাই পরা

কোনো লোককে তো কখনো হাদিস বলতে দেখিনি। চ্যানেল পাল্টালাম না। শুনতে লাগলাম। একটু পরে বুঝতে পারলাম, তিনি একজন ডাক্তার। কিন্তু একজন ডাক্তার ডাক্তারি না করে ধর্মপ্রচারে নামল কেন, সেটা আমার মাথায় ঢুকল না। লেকচারের একপর্যায়ে শুনি, লোকটি নিজেকে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের ছাত্র বলে ঘোষণা দিচ্ছেন।

আমি অবাক হলাম। একজন ডাক্তারের তো ডাক্তারি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হবার কথা। মেডিকেল সায়েন্সের কঠিন কঠিন টার্ম তিনি মুখস্থ করবেন, হাত উঁচিয়ে উঁচিয়ে সেসব মানুষকে বোঝাবেন—এটাই তো স্বাভাবিক; কিন্তু এ আবার কেমন ডাক্তার, যিনি কঠিন মেডিকেলীয় টার্মের বদলে স্টেজে দাঁড়িয়ে কুরআনের আয়াত নম্বর, হাদিস নম্বর, ফতোয়া নম্বর , বেদ, গীতা, রামায়ণ, বাইবেল, ত্রিপিটক থেকে এক নিঃশ্বাসে বলে যান। একটু থামাথামি নেই। স্টেজের সামনে রথী-মহারথী, সেলেব্রেটি, ধর্মগুরুরা আসীন। সবাই এই লোকের উপস্থিত বক্তৃতা, মেধা আর তার প্রয়োগ দেখে অবাক। একটু পরপরই সবাই হাততালি দিয়ে লোকটাকে অভিবাদন জানাচ্ছে।[১] একটা লোক কীভাবে এতকিছু একসাথে মুখস্থ রাখে? তাও আবার বইয়ের নাম, পৃষ্ঠা নম্বর, লাইন নম্বরসহ! আমি অভিভূত হলাম। এটা কীভাবে সম্ভব!

ছোটবেলায় শুনেছিলাম, কোনো এক বিখ্যাত ব্যক্তি নাকি যেকোনো বই একবার পড়েই বইয়ের পাতা ছিঁড়ে ফেলতেন। এর কারণ, একবার পড়লেই নাকি তার সব মুখস্থ হয়ে যেত। সেই বিখ্যাত ব্যক্তিকে আমি দেখিনি। কিন্তু কোট-টাই পরা এই লোকটিকে দেখে আমার মনে হলো, আল্লাহ তাআলা মনে হয় কাউকে কাউকে অসীম অনুগ্রহ দান করে থাকেন। ইনিও তাদের মধ্যকার একজন।

যে চ্যানেলে এই লোকটিকে প্রথম দেখি, সেই চ্যানেলটার নাম 'পিস টিভি'। আস্তে আস্তে নিয়মিত এই চ্যানেল দেখা শুরু করলাম। টিভি অন করে 'পিস টিভি' খুলে বসে অপেক্ষা করতাম। কবে আসবে সেই কোট-টাই পরা লোকটি। কখন শুনবো তার মনোমুগ্ধকর কথামালা। লোকটির নাম জাকির নায়েক। ডাক্তার জাকির নায়েক। জন্মেছেন আমাদের পাশের দেশ ভারতে।

---

১ উল্লেখ্য, হাততালি দেওয়া একটি গর্হিত কাজ এবং তা পরিত্যাজ্য। কখনো কখনো ইসলামি সভা-সম্মেলনেও অত্যুৎসাহী দর্শক-শ্রোতাকে হাততালি দিয়ে আলোচককে অভিবাদন জানাতে দেখা যায়। অভিবাদন জানানোর জন্য আরও অসংখ্য পন্থা আছে। তাই হাততালির বিষয়টি অবশ্যই বর্জনীয়। প্রয়োজনে দেখুন— https://islamqa.info/ar/105450 । —শরয়ি সম্পাদক

CamScanner

নিয়মিত পিস টিভি দেখার মধ্য দিয়ে আমি খেয়াল করলাম, আস্তে আস্তে আমার মাঝে কিছু পরিবর্তন আসতে শুরু করেছে। নামাজ পড়া শুরু করলাম নিয়মিত। এক সময়ে লোক দেখানো কিংবা নেহাৎ সমালোচনার ভয়ে নামাজ পড়লেও, এরপর থেকে মন থেকেই নামাজ পড়তে শুরু করলাম। আখেরাতের ভয় মনের মধ্যে জেঁকে বসেছে তখন। ওয়াজ মাহফিলগুলোতে যাওয়া শুরু করলাম। জামআতবদ্ধভাবে নামাজ পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে লাগলাম। বন্ধুদের নিয়ে আর সিনেমা দেখতে যাই না। আড্ডা দিই না। অহেতুক সময় নষ্ট করি না। দীন তখন আমার ধ্যান-জ্ঞানে পরিণত হতে শুরু করল। আমার জগত তখন ঘুটঘুটে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে ধাবমান। আমি আবিষ্কার করলাম, আমার অন্তরে শান্তির মোলায়েম বাতাস দোলা দিয়ে যাচ্ছে, আলহামদুলিল্লাহ। নিজের ইমানকে পাকাপোক্ত করা এবং আমলের পরিমাণ বাড়ানোতেই তখন আমার সবরকম মনোযোগ। দাঁড়ি-টুপিতে তখন আমি যেন এক ভিন্ন জগতের বাসিন্দা, যে জগতে মৃত আত্মারা প্রাণ ফিরে পায়, মৃত অন্তর ফিরে পায় তার চিরন্তন সজীবতা।

নিজের অ্যাকাডেমিক পড়াশোনাতেও আগের চেয়ে বেশি মনোযোগী হতে শুরু করেছি। স্টুডেন্ট হিসেবে কখনোই খারাপ ছিলাম না। প্রাইমারি, মাধ্যমিক সবগুলোতেই স্কলারশিপ পেয়েছি এবং জেলার মধ্যে প্রথম হয়েছিলাম।

কেবল পড়াশোনায় ভালো হবার ফলে সকলের কাছে আমি প্রশংসার পাত্র ছিলাম। কিন্তু যখনই আমি দীনে ফিরে আসি, দাঁড়ি রাখি এবং নামাজ-রোজার প্রতি ঝুঁকে পড়লাম, আমার চারপাশের চেনা পরিবেশটাই যেন হঠাৎ করে আমার কাছে অচেনা হয়ে গেল। আমার কাছের মানুষগুলোই যেন দূরে সরে যেতে লাগল। দাঁড়ি রাখার ফলে কত লোকের কত কটুকথা যে শুনতে হয়েছে আমাকে—তার ইয়ত্তা নেই। আমার দাড়ি নিয়ে স্যারেরা বিদ্রুপ করত। আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে বলত, "ছেলেটা আবার জঙ্গির সাথে যোগ দিল নাকি?"

কিছু কিছু আত্মীয়দের কাছে শুনেছি, আমাকে নিজেদের আত্মীয় বলে পরিচয় দিতেও নাকি তারা সংকোচ বোধ করে। কেন? কারণ, আমার দীন। আমার লেবাস। মাধ্যমিকের পরে ইচ্ছে ছিল নটরডেমে ভর্তি হবো। পরে শুনলাম, সেটা নাকি খ্রিস্টানদের কলেজ। সেখানে ভর্তির জন্যে ক্লিন সেভড হতে হয়। ভয়ে নটরডেমে পড়ার ইচ্ছাকে মাটিচাপা দিয়ে দিলাম।

সবচেয়ে ঝামেলার মধ্যে পড়তে হয়, যখন এইচএসসিতে রাজশাহী পড়তে যাই, তখন। বাংলাদেশে তখন অস্থিতিশীল রাজনৈতিক অবস্থা বিরাজ করছিল। সবদিকে দাড়ি-টুপিওয়ালা লোকদের ধরপাকড়, মার মার অবস্থা। আলহামদুলিল্লাহ, ক্যাম্পাসে এক কঠিন অবস্থা বিরাজমান থাকা সত্ত্বেও আমি সুন্নাহর উপর অটল, দৃঢ় ছিলাম।

এরকম কঠিন অবস্থার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে আমাকে। একদিকে কাছের মানুষদের বিমুখতা, একদিকে দাঁড়ি-টুপির উপর খড়্গহস্ত পরিবেশ, অন্যদিকে মেডিকেলে পড়ার সুতীব্র ইচ্ছা। আলহামদুলিল্লাহ, মহান রাব্বুল আলামিন আমাকে নিরাশ করেননি। আমি মেডিকেলে চান্স পেলাম। সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজে পড়ার সুযোগ করে দিলেন রাব্বে কারিম।

মেডিকেলে আসার পরে মনে হলো—নতুন আরেক জগতে চলে এসেছি। এখানকার স্যার আর ম্যাডামদের অবস্থা আরও খারাপ। সার্জারির ক্লাসে সেদিন প্রথম। আমাদের ক্লাস নিচ্ছিলেন জনৈক প্রফেসর। ভদ্রলোক তার নামের আগে মুহম্মাদ লেখেন। পড়াচ্ছিলেন সার্জিকেল ইন্সট্রুমেন্টস। আমার দিকে বাঁকা চোখে তাকিয়ে বলছিলেন—"এটার নাম অ্যালিস টিস্যু ফরসেপ। এটা কিন্তু মুসলমানদের আলি-রা: এর ফরসেপ না, মুসলমানদের মাথায় মারামারির চিন্তা ছাড়া ভালো কোনো চিন্তা নাই"।

আরেকদিন, কমিউনিটি মেডিসিনের জনৈক ম্যাডাম আমাকে বললেন—"এই, তোমরা যে মাটিতে টিপ দাও, কী লাভ হয় এতে?"

আফসোস! অথচ, তিনি মুসলিম পরিবারের মেয়ে।

ওই একই ডিপার্টমেন্টের অন্য একজন শ্রদ্ধেয়া ম্যাম তার লেকচার ক্লাসে বলছিলেন—"আমি শুনলাম, তোমাদের হোস্টেলে নাকি নামাজের জন্যে চাপ দেওয়া হয়? আমি যেহেতু একাডমিক কাউন্সিলের একজন সদস্য, এ ব্যাপারে অবশ্যই দাবি উত্থাপন করব, যেন নামাজের জন্যে আর ডাকাডাকি না করা হয়।"

মেডিকেলে একটা ব্যাপার আছে। চাইলেই কেউ স্যার বা ম্যাডামদের বিপক্ষে কথা বলতে পারে না। কেননা, আমাদের পাশের বেশিরভাগ নম্বর আসে ভাইভা থেকে। সুতরাং কোনো ভাই যদি এসবের বিপক্ষে মাথা তুলে জবাব দেন, আর দুর্ভাগ্যবশত

CamScanner

প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত দেখাতে না পারেন, তাহলে তাকে আর পাশ করতে হবে না। ওই ম্যাম ভাইভা নিলে তো ফেল করাবেনই, তবে তিনি যদি সুযোগ না পান, তাহলে অন্য স্যার বা ম্যামের মাধ্যমে ফেল করানোর বন্দোবস্তটাও সেরে ফেলবেন।

যা বলছিলাম, মেডিকেলীয় জীবনে মুসলমানিত্বের আড়ালে, নাস্তিক্যবাদ আর সেক্যুলারিজমের ছড়াছড়ি। এখানে কেউ দাড়ি-টুপি পরলেই 'হুজুর' ট্যাগ পেয়ে যায়, এবং এই হুজুরদের ভুলগুলো সবসময় 'বড় ভুল' হিসেবে দেখা হয়। মনে হয়—যেন তারা অচ্ছুৎ। অথচ অন্যরা শত শত ভুল করলেও, তাদের সবসময় মার্জনার চোখে দেখা হয়। বিষয়টি সামাজিক কাজকর্মের ক্ষেত্রে যেমন প্রযোজ্য, তেমনি পরীক্ষার ক্ষেত্রেও বলা চলে। আমি যখন প্রথম পেশাগত পরীক্ষার ভাইভা দিচ্ছিলাম, ভাইবা বোর্ডে কোনো একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিনি। শ্রদ্ধেয় ইন্টারন্যাল ম্যাম আমাকে বলেছিলেন,—"কী হুজুর, নামাজ পড়তে পড়তে তো কপালে দাগ লাগিয়ে ফেলেছ দেখছি। প্রশ্নের উত্তর দিতে পার না কেন? খালি নামাজ পড়লেই হবে, পড়াশোনা করা লাগবে না?"

নামাজের সাথে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারা বা না পারার কী সম্পর্ক, তা আমি বুঝিনি সেদিন। ভাইবা বোর্ডে একজন পরীক্ষার্থী সব প্রশ্নের উত্তর দিতে যে সমর্থ হবে, এমন নয়। তাই বলে তিনি আমার ধার্মিকতা নিয়ে কটাক্ষ করবেন কেন? নেহাত ইসলামবিদ্বেষ। অন্য কাউকে এরকম কিছু বলে এতটা মজা তিনি পান না, যতটা আমার ক্ষেত্রে পেয়েছেন। নিশ্চয় আমার মুসলমানিত্ব নিয়ে তিনি সন্তুষ্ট নন, অথবা অন্যরা যেন নামাজ না পড়ে সে ব্যাপারে তিনি অধিক তৎপর।

এসব যে শুধু আমার সাথে হয়—এরকম কিন্তু নয়। যারা যারাই আমার মতো দীন মোতাবেক, দীন মেনে চলার চেষ্টা করে, তালেবে ইলম হবার চেষ্টা করে, তাদের প্রত্যেকের সাথেই এরকম করা হয়।

আমাদের প্র্যাকটিসিং বোনদেরও যে কত ভোগান্তি পোহাতে হয়, তার সাক্ষী আমরা নিজেরাই। কিছু কিছু ক্ষেত্রে বোনদের ভোগান্তিটা অনেক বেশি। প্যাথোলজি ডিপার্টমেন্টের আমাদের জনৈক ম্যাডাম মেয়েদের পর্দা করা একদমই সহ্য করতে পারেন না। একদিন ক্লাসে বললেন,—"হিজাব পরতে এবং খুলতে তো অনেক সময় লাগে। এই সময়টা প্র্যাকটিকেল লেখায় ব্যয় করলেও তো বেশ কাজে আসে"।

এমন মন্তব্যে মাথা নিচু করে ঝিম মেরে সহ্য করা ছাড়া আমাদের আর কীইবা

করার থাকে? যেসব বোনেরা হিজাব পরেন, তাদের জঙ্গি বলে সম্বোধন করা। শ্রদ্ধেয় আরেক ম্যাডাম, ক্লাসে যারা দেরি করে আসেন তাদের 'রোহিঙ্গা' বলে গালি দিয়ে পরম তৃপ্তি পান।

শুধু কী স্যার আর ম্যাম? দীন পালন করতে গিয়ে ক্যাম্পাসের সিনিয়র বড় ভাই এবং আপুদের (যারা মোটাদাগে রাজনীতির সাথে যুক্ত) কাছে কতভাবে অপমান, অপদস্থ হতে হয় তার ইয়ত্তা নেই।

কারও বার্থডে সেলিব্রেইট না করলে, সে উপলক্ষ্যে টাকা চাইলে যদি টাকা দিতে অস্বীকৃতি জানাই, যদি বিভিন্ন দিবসে উপস্থিত না থাকি তো আমাদের অকথ্য ভাষায় অপমান করা হয়।

তবুও, যে হিদায়াতের রাস্তা আমার, আমাদের সামনে খুলে গেছে, শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও সেই পথে অটল থাকার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি, আলহামদুলিল্লাহ। বন্ধুর এই পথে আমাদের বন্ধু, আশ্রয়দাতা, সাহায্যদাতা একমাত্র আমাদের রব।

.....

"আমরা তোমারই ইবাদাত করি এবং তোমার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি।[১]"

.....